জার্নাল অব ইএলটি অ্যান্ড এডুকেশন | JOURNAL OF ELT AND EDUCATION
ISSN: 2618-1290 (Print), 2663-1482 (Online), Volume 6, Issue 1, Page: 42-47
Published by, Center for Academic Research and Development (CARD)

[**উদ্ধৃতি** ঃ গফফার, আব্দুল। ২০২৩। মাহমুদুল হক এর *খেলাঘর* ঃ মুক্তিযুদ্ধের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান। *জার্ণাল অব ইএলটি এন্ড এডুকেশন*, ৬(১), ৪২-৪৭]

গবেষণা পত্র

মাহমুদুল হক এর *খেলাঘর* ঃ মুক্তিযুদ্ধের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান

আব্দুল গফফার*

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীতে সংঘটিত সকল যুদ্ধেই যুদ্ধকবলিত দেশের মানুষ তিনটি বিশেষ দলে ভাগ হয়ে যায়। এর প্রথম দল– প্রতিরোধ গড়ে তোলার, দ্বিতীয় দল আক্রমণের শিকার এবং তৃতীয় দল দ্বিধাগ্রস্থের। উপন্যাস খেলাঘর-এ দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনা নিয়ে কাহিনি বিন্যস্ত হয়ে উল্লিখিত তিনটি শ্রেণির মানুষকে লেখক উপস্থাপন করেছেন– তিনটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। রেহানা চরিত্রটি আক্রান্তদের, ইয়াকুব দ্বিধাগ্রস্থের এবং স্কুলমাস্টার মুকুল প্রতিরোধের দলভুক্ত। এখানে সবচেয়ে বেশি এবং নিশ্চিত যৌন-লোলুপতার শিকার নারী এবং এর জন্য দায়ী তার শরীর। আক্রান্ত নারীর মনঃস্তত্ত্বে বিকলন-উদ্ভূত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মাহমুদুল হক এর *খেলাঘর* উপন্যাসে রেহানা তেমনি এক নারীচরিত্র। যদিও আক্রমণে উদ্ভূত বিকলনের চিত্র উপন্যাসে অনুপস্থিত, তদুপরি বিকলন-পরবর্তী রেহানার স্বপ্নময় কয়েকটি দিনের কথা জানা যায়– জানা যায়, ইয়াকুব নামের এক যুবকের সঙ্গে তার খেলাঘর গড়ে তোলার আশাব্যাঞ্জক কাহিনি। কিন্তু যুদ্ধে সর্বস্ব হারোনার দিকটি উন্মোচিত হলে, রেহানার অনেক সাধের খেলাঘর ভেঙে দুঃখময় পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। উপন্যাসটিতে মাহমুদুল হক অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে সেই *খেলাঘর* (১৯৯৮) ভেঙে যাওয়ার বৃত্তান্ত উপস্থাপন করেছেন। বাংলা উপন্যাস খেলাঘর-এ যুদ্ধপরবর্তী উল্লিখিত দিকগুলো বিশ্লেষণই আমাদের মূল উদ্দিষ্ট।

মূলশব্দ ঃ মুক্তিযুদ্ধ, খেলাঘর, ইয়াকুব, রেহেনা ।

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) প্রাতিস্বিকতায় উজ্জ্বল কৃতি ব্যক্তিত্ব। কাহিনির সঙ্গে অনুপম গদ্যের সমন্বয় সাধন করে তিনি নতুন সৃষ্টিশীলতার বিরল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত লেখক জীবনে কখনো স্বল্প কথন,কখনো দীর্ঘ বিরতি দিয়ে নিয়মিত লেখালেখি করেছেন তিনি। সনেট কবিতা, শিশুসাহিত্য রচনা করলেও তাঁর নিবিড় মনোযোগ ছিল গল্প-উপন্যাস রচনায়। বিষয়চেতনা, ভাবঋদ্ধতা, ভাষার উপস্থাপন-কৌশল এবং সর্বোপরি অভিনব ঢং-এ তিনি যে স্বাতন্ত্র্য সৃজন করেছেন, তা তুলনারোহিত। সাতচল্লিশের দেশভাগ, ষাটের দশকের ঔপনিবেশিককাল, সামরিক শাসন ও তার পরবর্তী বাঙালি জীবনের নানা অনুষঙ্গ তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত হলেও, মূলত মুক্তিযুদ্ধ তাঁর উপন্যাসের এক বড় অংশ জুড়ে স্থিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর সাহিত্যে যুক্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক বিভিন্ন অনুষঙ্গ। যুদ্ধকালীন, যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনা নিয়ে যে অধিকাংশ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *খেলাঘর* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক সৃষ্টিকর্মের মধ্যে বিশেষ স্বতন্ত্র্যের স্মারক হিসেবে চিহ্নিত। এই প্রসঙ্গে সমালোচক কামরুন নাহারের মতঃ

> '১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও বিষয়সমৃদ্ধ তাঁর উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে' (নাহার, ১৪২৭ ঃ ৭৫)।

উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধ চলমান– শঙ্কা আর নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ বিকট শব্দে প্রকম্পিত চারদিক। মানুষের উদ্ভ্রান্ত ছুটাছুটির অন্ত নেই। এরই মধ্যে রেহানা মিলিটারি কর্তৃক অপহৃত। কিছুদিন পর অসুস্থ অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকে সে। হাসপাতাল নেওয়া হলো তাকে। সামান্য স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়ার পর তাকে লুকানোর চেষ্টায় রেহানার ভাই টুনুর বন্ধু ইয়াকুবের কাছে পাঠানো হয়। ইয়াকুব উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত ঢাকা ছেড়ে সে গ্রামের একটি কলেজে শিক্ষকতার চাকরি নেয়। তার বাল্যবন্ধু মুকুলও সেই গ্রামের স্কুল শিক্ষক। যুদ্ধের ফলে স্কুল-কলেজ বন্ধ। এই অবসরে মুকুল মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সংগোপনে কাজ করে। অন্যদিকে ইয়াকুব নিষ্কর্মার মতো দিন পার করে। ঢাকায় যুদ্ধের ডামাডোল শুরু হয়ে গেছে। এই ডামাডোলের কারণে মুকুলের বন্ধু টুনু ঢাকা থেকে একটি চিঠি দিয়ে রেহানাকে পাঠিয়ে দেয় ইয়াকুবের কাছে। ইয়াকুব দায়িত্ব পায় তাকে কিছুদিন কাছে রাখার। মুকুল-ইয়াকুবের বাস ছিল আদিনাথের ভিটার পরিত্যক্ত এক বাড়িতে। সেখানেই রেহানাকে ইয়াকুবের সঙ্গে থাকতে হলো। এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হলে অনেকটা অজান্তেই দু-জনের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে ওঠে। পরের দিন হঠাৎ করেই টুনু আসে সেখানে। ইয়াকুব রেহানা সম্পর্কে টুনুর কাছ থেকে সবকিছু জানতে পারে, জানতে পরে রেহানার এই মনোবৈকল্যের পেছনের কারণ। কাহিনি শ্রবণে ইয়াকুব ব্যথিত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েও তাকে হারাতে চায় না। কিন্তু রেহানা জীবন-যন্ত্রণায় এই

*Corresponding Email: gaffar@rmu.ac.bd
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

সংসর্গে চূড়ান্তভাবে অসম্মতি জানায় এবং ঠিকানাহীন পথ বেঁছে নেয়। টুনু রেহানাকে নিয়ে যেতে চাইলে রেহানা ইয়াকুবের অনুরোধও অগ্রাহ্য করে।

কাহিনি বুননে ঔপন্যাসিক অসম্ভব সংযত এবং নির্মোহ। চরিত্রের পারম্পর্য রক্ষায় লেখক অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রগুলোর মুখের ভাষা কাল ও পরিবেশ উপযোগী। কাহিনির স্বাতন্ত্র্য হলো, ঔপন্যাসিক স্বল্প সংখ্যক চরিত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি বিশাল ক্যানভাসকে স্বল্প অবয়বে বৃত্তাবদ্ধ করেছেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তখন দেশটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। বারো শো মাইলের ব্যবধানে দুটি ভূখণ্ড, একটি দেশ। পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত ছিল আজকের বাংলাদেশ। রাষ্ট্রটির ক্ষমতার কেন্দ্রভাগে ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। স্বাধীন দেশ হলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীনতা পেল না। বরং পেল শোষণ-বৈষম্য। অর্থনীতি ভেঙে পড়ল। খুব বেশি দিন যেতে না যেতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়া শুরু করে। তারা প্রথমেই ভাষার আঘাতকে রুখে দিল ১৯৫২ সালে। এই বিজয়ে ৬ দফার মতো স্বায়ত্বশাসনের দাবি জোরালো হলো। পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের হাতে। খুব শিঘ্রই ৬ দফা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদে রূপ নিল। এরপর আইয়ুব খানের পতনের মধ্য দিয়ে '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান সার্থকতায় পর্যবসিত হলো। আন্দোলনের তীব্রতায় ভিত হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলো। জয় হলো ছাত্র-জনতার। এরপর '৭০-এর সাধারণ নির্বাচন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল আওয়ামী লীগ। ধীরে ধীরে স্বাধিকার আন্দোলন তীব্রতর হলো। প্রভুত্বশক্তিকে অটুট রাখতে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকার একাত্তরের মার্চে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের পরিকল্পিত গণহত্যার মাধ্যেমে পূর্ববাংলার যে অকথ্য ও নির্মম অত্যাচার, ধ্বংসযজ্ঞ আর লুটপাট চালাচ্ছিল তাতে যুক্ত হয়েছিল পরিকল্পিত ধর্ষণ। বাঙালির সম্মিলিত প্রতিবাদ, প্রতিরোধে তা থেকে মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয় একাত্তর। ত্রিশ লাখ মানুষ শহিদ হয় এইযুদ্ধে, তিন লক্ষাধিক নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। বাঙালি বসে থাকেনি। শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সোচ্চার হলো। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার দীক্ষা পেল। গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, জীবনজীবিকার দুর্ভোগ, শঙ্কা ইত্যাদি তুচ্ছজ্ঞান করে সকল পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত হলো। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিল বাংলাদেশ। সত্য হলো,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ও নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, যে আশা যে ভরসায় বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, সে আশার পরিপূর্ণতা পেতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল বাংলাদেশের। বলা চলে, এখনো প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে বাংলাদেশ। এই প্রসঙ্গে কামরুন নাহারের একটি উদ্ধৃতি স্মরণযোগ্য ঃ

> বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে ধর্মীয় ও মৌলবাদী আদর্শের রাজনীতি প্রবেশ করছে একনায়ক এবং সামারিক স্বৈরাচারের পৃষ্টপোষকতায়। ফলে, গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ক্রমে ক্রমে পিছু হটতে থাকে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মনির্ভর রাজনীতি দেশপ্রেমী চেতনার বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিয়ে বিকশিত হতে থাকে ননাভাবে। এমন পরিস্থিতিতে ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হক মুক্তিযুদ্ধাশ্রিত উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশের ঘটনাটি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক (নাহার, ১৪২৭ ঃ ৮১)।

ক্ষমতা বর্তমান বিশ্বে মানবপ্রত্যাশার সর্বোত্তম প্রাপ্তি। ক্ষমতা ও আধিপত্য ধরে রাখতে শুরু হয় দ্বন্দ্বের। এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতি যুদ্ধ। যুদ্ধে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মের উপর এর প্রভাব পড়ে। সমাজে নানা ধরনের নিষ্ঠুরতা দেখা যায়। হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদি চলতে থাকে অহরহ। মানুষে মানুষে হারিয়ে যায় বিশ্বাস, ভালোবাসা– জন্ম নেয় ঘৃণার। এই সকল বিষয়গুলো আমরা অন্য সব উপন্যাসের মধ্যে বিস্তৃতভাবে খুঁজে না পেলেও মাহমুদুল হকের উপন্যাসে খুঁজে পাই। এই প্রসঙ্গে সরকার আব্দুল মান্নান যথার্থই উচ্চারণ করেছেন ঃ

> দেশপ্রেম, প্রেরণা, আবেগ, মধ্যবিত্তসুলভ দোলাচল ও নিষ্ক্রিয়তা, অপশক্তি, শান্তি, নিষ্ঠুরতা, প্রণয় ইত্যাকার বিচিত্র বিষয় ও চেতনা-চিহ্ন নিয়ে রচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস। কিন্তু অধিকাংশ উপন্যাসের মধ্যেই জীবনের রহস্যময় অধ্যায়ের সৌন্দর্য ও ভাবনার মাত্রা-মাত্রান্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। মাহমুদুল হক এই ধারার একন্তই ব্যতিক্রম। তাঁর মূল আশ্রই জীবনের রহস্যময় ও নিঃসঙ্গ পটভূমি। ফলে তাঁর মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর মধ্যেও যেন নানা রূপে চিহ্নিত হয়ে যায় সেই সব মানুষের অন্তরাত্মার স্বরূপ (মান্নান, ২০০৭ ঃ ১২৮)।

যুদ্ধ সব সময় রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসযজ্ঞের। বাংলাদেশে সংঘটিত ১৯৭১ সালের যুদ্ধও এর ব্যতিক্রম নয়। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হয়। সদ্য স্বাধীন দেশটির পুর্নগঠন ছিল আবশ্যকীয় একটি কাজ। যুদ্ধকালে দেশের ধন-সম্পদ, অবকাঠামো ও জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়– ভেঙে পড়ে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, রাস্তাঘাট ইত্যাদি ব্যবস্থা। মানুষ বেকার হয়ে যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র, খাদ্য শস্যের অভাব দেখা দেয়। আবার যুদ্ধপরবর্তী ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনকারী প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি শরণার্থী ফিরে এলে দেশে দেখা দেয় এক দুর্ভিক্ষ। এটি '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে বাংলাদেশের জনগনসহ সদ্য ফেরা শরণার্থীদের পুনর্বাসন ছিল সরকারের এক বড় চ্যালেঞ্জ। বঙ্গবন্ধু সরকার এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পদক্ষেপের অংশ হিসেবে প্রথমেই তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে যে সকল নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের কথা ভাবলেন। আমিনুর রহমানের ভাষ্যমতে ঃ

> মুক্তিযুদ্ধকালে ধর্ষিত নারীদের বঙ্গবন্ধু 'বীরাঙ্গণা' হিসেবে বরণ করে নেন। শুধু তাই নয়, তৎকালীন সরকার নির্যাতনের শিকার নারীদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ সংস্থা গঠন করে বিভিন্ন জেলায় শাখা কেন্দ্র স্থাপন করে। গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাতের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করে গর্ভপাতকে সাময়িককালের জন্য এক ধরনের বৈধতা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি যুদ্ধ শিশুদের বিদেশে দত্তক গ্রহণের জন্য বিশেষ বিধান ও ব্যবস্থা সরকার নিয়েছিল (রহমান, ১৪২৪ ঃ ১৬)।

স্বাধীনতার পর রাজনীতিতে যুদ্ধের প্রভাব প্রবল আকারে দৃশ্যমান হয়। বর্ষিয়ান ও তুখোড় রাজনীতিকদের প্রভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। চাটুকারবৃত্তি, স্বার্থপরতা, আত্মোন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার ক্রমোন্নয়ন ঘটে। এই সব কারণে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এরই সূত্র ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। রাজনৈতিক এই অস্থিরতার কারণে সংঘাত-সংঘর্ষের আশঙ্কা বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুসংঘাত এড়াতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু এতে বিপথগামি নেতৃত্বের অসন্তোষের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। পরিস্থিতি বৈপরীত্যের রোষানলে পর্যবসিত হয় এবং বঙ্গবন্ধুকে জীবন দিতে হয় সপরিবারে।

যুদ্ধকালীন ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা পাকিস্তানিদের ধ্বংসযজ্ঞের নানা পদক্ষেপে সহযোগী হিসেবে কাজ করে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের এই দৌরাত্ম আর থাকেনি। ক্ষমতা হারিয়ে তারা নিজেদেরকে দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় করে রাখে।এই সকল নেতারা অনুধাবন করে, মানুষ ধর্মস্পর্শকাতর এবং ভীরু। এই ধর্মকে সামনে রেখে মানুষকে সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। ফলে তারা ধর্মকে পুঁজি করে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে। নেতৃত্বকে ফিরে পেতে সুদূর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা দেশের প্রশাসনযন্ত্রে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে দেশের মধ্যে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে তৎপর হয়। এর ফলে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়, একই সঙ্গেধর্ম ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়।

স্বাধীনতার পর নবনির্বাচিত মুজিব সরকার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের পুনর্বাসন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি নানা বিষয় সংকট তৈরি হয়। যুদ্ধকালে দেশের ধন-সম্পদ, অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এরই সঙ্গে ভেঙে পড়ে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, রাস্তাঘাট ইত্যাদি ব্যবস্থা। এর প্রভাব পড়ে অর্থনীতিতে এবং অচলাবস্থা তৈরি হয়। এই অর্থনৈতিক অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে যুথবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয়করণ করে, আহ্বান জানায়বিভিন্ন এনজিওকে।

জাতির পরিচয় ফুটে ওঠে তাদের চর্চিত সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে। তাদের চিন্তা-চেতনা-দর্শনের প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যকর্মে। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যে লক্ষ করলে দেখা যায়, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যে প্রতিবন্ধকতা ও কূপমণ্ডুকতা ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে উদারনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটল। এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই যুদ্ধ-পরবর্তী অসংখ্য কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, চলচ্চিত্র, গান ইত্যাদি সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মে। বলা চলে, মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্যের একটা বিরাট কলেবর জুড়ে অবস্থান করে বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক চেতনায় সমৃদ্ধ করেছে।

পাকিস্তানী বিবেকহীন পেটোয়া বাহিনী দেখে দেখে, সুযোগ বুঝে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অশিক্ষিত, নারী অধ্যুষিত এলাকায় তাদের বর্বরতা বেশি চালাচ্ছিল। তারা গ্রামের যন্ত্রাইল তাঁতী পাড়ায় ঢুকে এমন নষ্টামি শুরু করে, সুযোগ বুঝে কর্মব্যস্ত তাঁতীরা নিজেদের পেশা নিয়ে উদ্বিগ্ন। মুকুল বলে ঃ

> ইছামতি পার হয়ে হুট করে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর্মিরা। তাঁত আর তাঁতি-তাদের লক্ষ্য দুটোই। নদীর দিক থেকে বেড় দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা এগিয়ে এল, আগুন ধোঁয়া আর চিৎকারের মাঝখানে যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়, যারা পারে না, তাদের ধরে ধরে জ্বলন্ত তাঁতের ওপর ছুঁড়ে দিতে থাকে (এনাম, ২০২০ ঃ ৩৩১)।

আর্মির টোল থেকে নির্যাতিত হয়ে ফেরৎ আসা মৃত্যুপ্রায় রেহানার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মুকুল-ইয়াকুব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। ইয়াকুব রেহানাকে নিয়ে আশাবাদী, রেহানা সম্পর্কে তার প্রশ্নের অন্ত নেই কিন্তু মুকুরের ভিতরে দারুন চঞ্চলতা, কথা বলার এক পর্যায়ে প্রসঙ্গ বদলিয়ে মুকুল বলে :'হোনোছ নাই, গোদানাইলে কী হইছে?' মুকুল আমার মুখের দিকে চলক ওঠা চোখে তাকিয়ে বলে, 'পাটের গোডাউন পুইড়া ছাই হয়া গেছে, গোবিলারা লাগাইছে। অহনে হ্যারায় বুঝাতাছে না? (এনাম, ২০২০ ঃ ৩৩১)

যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার আনন্দে কে না আন্দোলিত হয়? দু-পক্ষের যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, হয় মরবো না হয় বাঁচার মতো বাঁচবে। এমন ই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যায় আমাদের *খেলাঘর* উপন্যাসের মুক্তিযোদ্ধা মুকুল। কখনো প্রত্যক্ষ কখানো বা পরোক্ষ ভূমিকায় অবস্থান করে যুদ্ধকে বেগবান করে চলেছে মি. মুকুল। প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের আনন্দধ্বনি আমরা তার মুখ থেকে শুনি ঠিক এভাবে ঃ

> মুকুল তুমুল উৎসাহে চমকে উঠে আগলা গালিমপুরের মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ডের এক লম্বা বিবরণ দেয়। আর্মি বোঝায় একটা লরীকে গেরিলারা কীভাবে ছারখার করে দিয়েছে, কীভাবে পাঞ্জাবিরা পিপড়ের মতো নদীতে হাবুডুবু খেয়ে মরেছে, খুটিয়ে খুটিয়ে মুকুল সেই সব বলতে থাকে (এনাম, ২০২০ ঃ ৩৪৫)।

মানুষ মাত্রেই কমবেশি আমিত্বে বিশ্বাসী। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে যখন টানাটানি প্রবল আকার ধারণ করেছে। প্রত্যেকেই যার যার জায়গা থেকেতখন দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। উপন্যাসে ইয়াকুবের বন্ধু মুকুল শিক্ষকতার পাশাপাশি যাত্রাদলের তুখোড় অভিনেতা। পেশার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়েও দেশমাতৃকার টান তাকে প্রলুব্ধ করে। উপন্যাস থেকে জানা যায় ঃ

> মুকুল যাত্রাপাগল মানুষ ...। নিজেও তুখোড় অভিনেতা। পেশাদার যাত্রাদলের বড় একটা পা পড়ে না এদিকে, মুকুল একাই জমিয়ে রাখে। ... যে মুকুল স্কুল মাস্টারি আর যাত্রা ফাত্রা নিয়ে এতদিন টিমে আলসেমির ভেতর থাকে নাক চবিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি, তাকেও দেখি কিছু একটা নিয়ে ভীষণ তৎপরতায় মেতে উঠেছে (এনাম, ২০২০ ঃ ৩১৯, ৩২৭)।

মুক্তিযুদ্ধের ধুমধাড়াক্কা, দৌড়ঝাঁপে চারিদিকে আকাশ বাতাস যেন ভারি হয়ে আসছে। কখনো বুটের ঘটঘট শব্দ, কখনো গুলির ঠাস ঠাস শব্দ, কখনো মিলেটারি কর্তৃক ধৃতের আত্মচিৎকার কোথাও লাশ এ যেন অন্য রকম এক মৃত্যুপুরী। ইয়াকুবও রেহানার সঙ্গে দেখা করতে এসে মুকুল পাশেই একটা ভাসন্ত লাশ দেখতে পায়। লোকটা কে (এনাম, ২০২০ ঃ ৩০০)? ইয়াকুবের প্রশ্নের উত্তরে শুনি– লোকটি পেনাবিবির মাইয়ার জামাই হতে পারে বলে ধারণা করে মুকুল ঃ

> মোতড়ার ঘন বনের কোরে একটা লাশ। দড়িটা হাতে নিয়ে নীরবে একটা ফাঁস তৈরি করে মুকুল। ... দু-তিনবার ছোঁড়ার পর ফাঁসটা গলার ওপর গিয়ে পড়ে। ... কোমরপানি ভেঙে লাশটাকে হিজল বনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে মুকুল। ...

> মনে হয় বিশাল একটা দেত্য, এমনভাবে ফুলেছে, ... একটু একটু করে লাশটা ধান খেতের আড়ালে আপনা-আপনি ভেসে যেতে থাকে (এনাম, ২০২০ ঃ ৩২৯-৩৩০)।

পাকহানাদার বাহিনীর আক্রমণ এবং অমানবিক অত্যাচারের দৃশ্য প্রত্যেক মানুষকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। অনেকে তার নিজ পেশা ছেড়ে অন্য পেশা ধরে আবার কেউ শহর ছেড়ে গ্রামে এসে কোনো একভাবে জীবনযাপন করে। আমাদের নায়ক ইয়াকুব দেশে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবার আগে একবছর মতো ঢাকার একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করতো। জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হলে সে তার পোশা ছেড়ে গ্রামে চলে আসে এবং কলেজ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ঃ

> রক্তগঙ্গা বয়ে যাওয়ার পর ঢাকা শহর ছেড়ে পালানো দিশেহারা মানুষজনের অনেকেই নতুনভাবে অনেক অভ্যেস রাংঝালাই করে নিচ্ছে। গ্রামের কলেজে মাস্টারি করলেও মাঝের বেশ কিছু বছর কেটেছে ঢাকায় (এনাম, ২০২০ ঃ ৩১৩)।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙ্গালির উপর অতির্কিত হামলা চলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়র রোকেয়া হলে থাকত রেহানা। অনেক মেয়ের মতো তাকেও পাওয়া যায় ঢাকার রাজপথে। টুনুর বক্তব্যে রেহানার জীবনের কাহিনি এবং যুদ্ধে নারী নির্যাতনের চিত্র পাঠকদের কাছে উন্মোচিত হয় এভাবে : 'সাতদিন ধরে রেহানা মেডিকেল কলেজে পড়ে আছে। এক ভোরবেলায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে হাসপাতালে তুলে দিয়ে যায় কেউ (এনাম, ২০২০ ঃ ৩২৮)।

ঢাকা ফেরৎ ইয়াকুবের মধ্যে যুদ্ধের দামামা না বাজলেও যুদ্ধের তৎপরতা আমরা মুকুলের মধ্যে পুরোপুরি দেখতে পাই। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ, পরামর্শ, তাদের অস্ত্রের যোগাড়, তাদের খাবার-দাবার, নতুন নতুন জায়গা চিনিয়ে দেওয়া এবং তাদের ট্রেনিং সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে সব সময় মুকুলকে আমরা তৎপর দেখি ঃ

> মনে হল যেকোনো কারণেই হোক মুকুল যেন একটু বেশি রকমের ব্যস্ত; ভেতরে ভেতরে অস্থির, তার কোনো তাড়া আছে। 'আমারে আবার হেই মধ্যপাড়ায় মেলা করতে হইব, সব বুইঝা ল' (এনাম, ২০২০ ঃ ৩১৭)।

একদিকে পাক হানাদার বাহিনী, অন্যদিকে শান্তি কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয় জয়নাল শেখের মতো কিছু লোকের দৌরাত্ব। মানবতা তখন লুণ্ঠিত, কে কখন কোথায় অ্যাটাক হয় তথা আক্রমনের শিখার হয় কেউ জানে না। এমনই এক অস্থির এবং বাজে সময় পার করছিল সবাই। যার দাপটে গোটা এলাকা থর থর করে কাঁপে, সেই পিয়ার মোহাম্মদও হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে যায় ঃ

> সুবচনী থেকে কোনো একটা কাজ সেরে ফেরার পথে পোড়াগঙ্গার খালে দুম করে আক্রান্ত হয়ে যায় পিয়ার মোহাম্মদের নৌকো। ... খাগড়াবনের আড়ালে গুড়ুম গুড়ুম করে দুটো গুলির শব্দ ফাটতেই নৌকোর পাটাতনের ওপর সটান হয়ে শুয়ে পড়ে পিয়ার মোহাম্মদ। ততক্ষণে ডান কাঁধের একটা পাশে যা গাঁথার তা গেঁথে গেছে (এনাম, ২০২০ ঃ ৩১৭)।

ঢাকা ছাড়ো, ঢাকা ছাড়ো। এ যেন প্রত্যেক হৃদয়ের এক সত্য বচন। যে ঢাকায় মানুষের ভিড়ে পা ফেলবার কোনো ফুরসত থাকে না, সেই ঢাকার বাতাস আজ মেলেটারীদের জুতার আওয়াজ, ধর্ষিতার আত্মচিৎকার, স্বজন হারানোর আহাজারিতে ভারী হয়ে গেছে ভীষণভাবে। যে যার মতো গ্রামে যেয়ে কোনো মতে জীবনটাকে বাঁচাচ্ছে। অবস্থাটা ঠিক এমন : 'গুলির শব্দের ভয়ে ঢাকা শহরে না কি এখন আর একটি পাখিও ডাকে না। সত্য-মিথ্যা জানি না, তবে শহর থেকে যারাই আসে, তাদের সকলের মুখে এই একই কথা শুনতে পাই' (এনাম, ২০২০ ঃ ৩২৭)। এমনি এক বিভীষিকাময় সময় পার করছিল ঢাকাবাসী। মনোয়ার ওরফে টুনু তার চাচাতো বোন রেহানাকে বন্ধু ইয়াকুবের কাছে পাঠিয়ে অন্তত প্রাণে বাঁচায়– চিঠির ভাষণ এমন ঃ

> রেহানা আমার চাচাতো বোন; নিজের হেফাজতে রাখিস। কতগুলো কারণে ওকে ঢাকা থেকে সরিয়ে দিতে হল। ... তোকে একটু জ্বালাতন সহ্য করতে হবে, দেশের যে অবস্থা তাতে এই জ্বালাতনটুকু কুব বেশি একটা কিছু নয়, এর চেয়ে দেশের মানুষ অনেক বেশি সহ্য করছে, অনেক বেশি ... শিগগির আসছি (এনাম, ২০২০ ঃ ৩২৬)।

১৯৭১ সালের কালো রাতে ঢাকার সকল জায়গার মতো রোকেয়া হলও টার্গেটের বাইরে থাকেনি। কারণ সেখনে আওরাতের বসবাস। পাকসেনারা তাদের যৌনতা নিবৃত্ত করতেই ছাত্রীহলকে বেছে নেয়। ঐ হলের অনেকের মতো রেহানাও লোলুপতার শিকার। ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেনঃ

> রেহানাকে টুনু তার বন্ধু ইয়াকুবের আশায় পাঠায়। কলেজ শিক্ষক ইয়াকুবের সঙ্গে রেহানার খেলাঘর নির্মিত হয় এক পরিত্যাক্ত দালানে, যা আদিনাথের ভিটা নামে পরিচিত ছিল। বাড়ির চারদিকে ঝোপঝাড় আর জঙ্গল" (আলপনা ২০১৭ ঃ ৫৯)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল থেকে তুলে নিয়ে মিলেটারি ক্যাম্পে অত্যাচারিত রেহানা এখন চাচাতো ভাই টুনুর মাধ্যমে গ্রামে এসে মিঠুসার গ্রামের আদিনাথের ভিটে নামক বাড়িতে মিষ্টি মধুর এক জীবন অতিবাহিত করছে। রেহানা ২৫ মার্চ রাতের অত্যাচারের ফলে কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে যায়। নায়ক ইয়াকুব বিষয়টি জানে অনেক পরে। অজানা, অচেনা বন্ধুর ছোটবোন রেহানাকে নিয়ে বনমধ্যে এক পোড়োবাড়ি পরিত্যক্ত বাড়িতে ভালোই চলছিল জীবন-যাত্রা। তাদের রান্না-বান্নার এমনি এক সংসারী আলাপনের দৃশ্য আমরা দেখতে পাই ঃ

> 'এখন আমি কী দিয়ে ডালটা বাগার দিই বলোতো! একটু পেঁয়াজ-রসুনের কিছু পেলেই হয়ে যেত–'
> 'নাও না চালিয়ে কোনোমতে, কেউ তো আর এখানে দাওয়াত খেতে আসছে না–' (এনাম, ২০২০ ঃ ৩৩৭)।

শিক্ষকতা এক মহান পেশা। ভালো শিক্ষকের মর্যাদা বা কদর ছিল, আছে এবং থাকবে। উপন্যাসের মুকুল চন্দ্রও তেমনি একজন নামডাকওলা শিক্ষক। এলাকার সবচেয়ে দাপুটে নেতা বি.ডি. পেয়ার মোহাম্মদ তার ছেলে তবিবতকে পড়ানোর জন্য মুকুলচন্দ্রকে নির্বাচন করা হয়। আর মুকুলচন্দ্রের থাকবার প্রসঙ্গ আসলে পিয়ার মোহাম্মদ আদিনাথের ভিটেয় থাকবার ব্যবস্থা করে দেয় (স্কুল মাস্টারিতে তার ভালোভাবেই চলে যেত, তবে মাথা গোঁজার সমস্যা ছিল)।

> বি.ডি. পিয়ার মোহাম্মদের একটি মাত্র ছেলে তবিবত একটু বোকা ধরনের; পরপর দুবছর ফেল মারায় মুকুলের ওপর ভার পড়ে তাকে পোক্ত করার। মাস্টারিতে মুকুলের সুনাম ছিল। সেই সুবাদেই তাকে তবিবতের ভার নিতে হয় (এনাম, ২০২০ ঃ ৩১৪)।

অতিথিপরায়ণতায় বাঙালির সুনাম বিশ্বজোড়া। চারিদিক নিরাপত্তাহীনতা, বাতাসে লাশের গন্ধ, বন্দুকের আওয়াজ– সবকিছু মিলিয়ে ভীষণ বিরক্তিকর এক সময় পার করেছেবীর বাঙালিরা। এর মধ্যেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা একে অপরের সহোযোগিতায় এতটুকু কার্পণ্য করেনি। উপন্যাসে দেখা যায় ঃ

> জীবনের ঝুঁকি নিয়েও এই সময় তাড়া-খাওয়া বাইরের মানুষজনকে যে যার ক্ষমতা মতো নির্বিচারে আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে, যার কিছু নেই সেও অন্তত দুমুঠো শুকনো চিঁড়ে আর এক গ্লাস পানি দেয়ার মতো মন রাখে (এনাম, ২০২০ ঃ ৩৩৯)।

মাহমুদুল *হক খেলাঘর* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের হালচাল বর্ণনা করতে যেয়ে মানব জীবনের নানা অনুষঙ্গ এঁকেছেন দরদি হাতের ছোঁয়ায়। এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ জীবনের কোনো মানেই হয় না। কী হবে এত সুন্দর গাড়ি-বাড়ি দিয়ে এ সব রেখে একদিন তো চলে যেতে হবে এই নশ্বর দুনিয়া থেকে। সবই পড়ে থাকবে অমর অক্ষয় হয়ে, থাকবো না কেবল আমি। তাহলে কেন এতো এতো এতো কিছু করার চেষ্টা কেন মানুষকে ঠকানো কেন প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে এত খুন, ধর্ষণ, অনাচার অত্যাচার, রেহানা-ইয়াকুবের আলাপ-চারিতায় আমরা এই বিষয়টি লক্ষ করি ঃ

> 'কেন যে মানুষ জায়গাজমি বাড়িঘরদোর করে, আমার মাথায় আসে না–' ... 'তার মানে? হঠাৎ–'
> 'এই দেখো না, আদিনাথের ভিটেবাড়িটাকেই; এটা খাড়া করার জন্যে হয়তো কারো গলায় ছুরি বসিয়েছিল; চুরি-চোট্টামি হেন কাজ নেই যা করেনি, কিংবা ধরো এসব কিছু নয়; ব্যবসার পোছনে দিন রাত গরু– খাটুনি খেটে এই সব জায়গাজমি করেছিল। ... কিন্তু কী লাভ, কবে মরে সব ভূত হয়ে গেছে, এখন বাতি জ্বালাবারও কেউ নেই;' (এনাম, ২০২০ ঃ ৩৪০)।

প্রভাব, প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বর্তমান সময়ে যেমন খুন, রাহাজানি চলমান, ঠিক তেমনি তৎকালীন সময়ের চালচিত্র *খেলাঘর* উপন্যাসে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। বি.ডি. পিয়ার মোহাম্মদ এমনই এক ত্রাসসৃষ্টিকারী দাপুটে নেতা। হেন খারাপ কাজ নেই যা সে করে না। নতুন নতুন নারী ভোগ তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার লাম্পট্যের বিরুদ্ধে কথা বলে হেন সাহসও কেউ রাখতো না।"কার ঘাড়ে দশটা মাথা পিয়ার মোহাম্মদের কথা ফেলে, আচকাল পায়জামা পরে সে আর নাটেশ্বরের ইদু ছৈয়াল এক সময় আয়ুব খানের ইফতার পার্টিতে পাত পেতেছে ব্যাপার স্যাপারই আলাদা" (এনাম, ২০২০ ঃ ৩১৪)।

খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, মেয়েপাচারসহ সকল অনৈতিক কাজে একমাত্র হোতা ও আশ্রয়দাতা পি.ডি. পেয়ার মোহাম্মদ। হুমকি ধামকিতেও সে সেরা। প্রতি রাতে বোতল খেলে মেয়েদের সাথে সময় দেবার সময় পিয়ার মোহাম্মদ মুকুলচন্দ্রকে জড়ানো কণ্ঠে বলে ঃ

> তার চৌকির তলায় কখনো কখনো দু-একটা ক্যারু কোম্পানির বোতল পড়ে থাকে, ... দেইখো মাস্টার, মাইনসের কানে গ্যালে কইলাম ইজ্জতে আলপিন হয়া যাইব। কেউরে ঘরে নিবা না, লুকায়া থুইয়া দিবা বোতলখান, ইজ্জত নিয়া কারবার – (এনাম, ২০২০ ঃ ৩১৫)।

খেলাঘর উপন্যাসে আমরা দেখি, টাকা উপার্জনের জন্য অভাবি বাবা-মা তার ষোড়শী মেয়েকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে সানন্দে সময় কাটায় টাকার অপেক্ষায়। বি.ডি. পিয়ার মোহাম্মদও সেই সুযোগটি আগ্রহের সঙ্গে কাজে লাগায়। 'অমন আটপিঠে ধাড়িবাজ একটা লোক, যার কথায় গ্রামের লোকজন টু শব্দটি না তুলে ওঠবোস করে' (এনাম, ২০২০ ঃ ৩১৫)। অপেক্ষাকৃত বেশি মেয়েমানুষ এবং ঘনবসতিপূর্ণ ঐ এলাকায় পেয়ার মোহাম্মদ এমন টোপ ফেলতো ঃ

> এক একটা দুস্থ পরিবারের মা-বাবা ইচ্ছে করে নিজেদের মেয়েদের অপরের হাতে তুলেদেন, ... তাদের ঘরে ঘরে মেয়েও প্রচুর; ... শঙ্খনিধি রোডের মজনু সুন্দরী দয়সা আর জুমবাইল লেনের পেনাবিবি মাঝে মাঝে এরাও এসে দু-একরাত থেকে যায়" (এনাম, ২০২০ ঃ ৩১৫)।

মানুষ সামাজিক জীব। যতই অপরিচিত হোক না কেন এক সঙ্গে কিছু দিন একই সমাজে বসবাস করলে একে অপরের খুব কাছের হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। পাঞ্জাবি সেনাদের দ্বারা রাতের পর রাত ধর্ষণের ফলে অনেকটাই অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়া রেহানা। নিবিড় পরিচর্যা এবং নিরাপত্তা খুঁজে পায় গ্রাম্য শিক্ষক ইয়াকুবের কাছে। মনের অজান্তেই তারা একে অপরকে ভীষণ আপন ভাবতে থাকে এবং ভালবাসার আদান প্রদান শুরু হয়। জলপিপি, অধ্যায়ে আমরা দেখি ঃ

> আন্না একটা হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। তারপর চোখে আর কপালে চুমু খায়। ... আন্নার হাত আমার গলায় জড়ানো, সে তার দিকে একটু করে টানতে থাকে; ... আমার হাত নিয়ে তার বুকের ওপর চেপে ধরল সে, 'বুঝতে পারো, আমার কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছে।'পাগলের মতো আমি ওর গালে চুমু খাই, তারপর দু হাতে হাঁটুজাড়িয়ে ধরে মাথা নিচু করে পড়ে থাকি (এনাম, ২০২০ ঃ ৩৪১)।

মানুষ মাত্রই সুখ প্রত্যাশী। সুখ নামক সোনার হরিণ অনেকের জীবনে হয়তো বা অধরায় থেকে যায়। তেমনি এক দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল উপন্যাসের রেহানা। ছোটকালে সে বাবা-মা কারো আদর ভালোবাসা পায়নি। বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে সে এসেছিল উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে। দেশের সেবায় হয়তো আত্মনিয়োগ করবে কোনো একদিন। সেখানে সে হলো পাকসেনাদের ধর্ষণের শিকার। রাস্তায় ফেলে রাখা হয় তাকে। হাসপাতালের সেবা শেষে টুনুর মাধ্যমে দেখা মেলে সরল বিশ্বাসের যুবক ইয়াকুবের সঙ্গে। ইতোমধ্যে টুনু আর ইয়াকুবের কথোপকথনে রেহানার জীবনের অজানা কালো অধ্যায় ফাঁস হলে, রেহানা আড়াল থেকে তা জেনে যায়। রেহানা ভাবে, এখন ইয়াকুব তাকে আর বিশ্বাস করবে না। তাদের ভালোবাসার খেলার ঘর টিকবে না। এই আশঙ্কায় ও লজ্জায় তৎক্ষণাৎ রেহানা চাচাতো ভাই টুনুর সঙ্গে অনিশ্চিত জীবনে পাড়ি দেয়। রেহানার জীবনটাই অনিশ্চয়তায় ভরা। সুখ-সমৃদ্ধ তার ভাগ্যে কোনো কালেই জোটেনি। রেহানার বাল্যকালের কথা আমরা টুনুর কাছ থেকে জানতে পারি ঃ

> যখন কোলের, তখন আরেকজনের সঙ্গে পালিয়ে গেল ওর মা; লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে না পেরে শেষে গলায় দড়ি দিল বাপটাও। দাদা-দাদির কাছে মানুষ। বংশের একমাত্র মেয়ে– (এনাম, ২০২০ ঃ ৩৫৪)।

এই উপন্যাসে মাহমুদুল হক– ইয়াকুবের ও রেহানার দুদিনের খেলাঘর রচনা করেছেন। প্রায় অবিশ্বাস্য বাস্তবতা দিয়ে, নিয়তি-কঠিন সারল্যে, মুক্তিযুদ্ধের বাইরে ক্ষণিকের শান্তিদীপে ঢাকার আঞ্চলিক জাদুকরী সরল ভাষার কথোপকথন দিয়ে। প্রকৃতির গভীর গভীর বাড়ির ভেতরে সকল আয়োজন ও আবহ শেষ পর্যন্ত আমাদের মায়াজালের বন্দিশিবিরে আচ্ছন্ন করে রাখে। যুদ্ধের ভেতরে যুদ্ধ বিরোধী-চেতনায় আন্দোলিত, অথচ সুস্থির চরিত্র আন্না (বিপ্রদাস, ২০১০ ঃ ১৮০)।

নিজ বোনের উপর এমন অত্যাচার টুনু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তেমনিভাবে বিষয় বিশ্বাস করতেও সর্বোচ্চ হচ্ছে সরল সোজা উপকারী যুবক ইয়াকুবের। ইয়াকুব হু হু কান্না শুরু করে দেয়। দুই বন্ধুই যখন অস্বাভাবিক হয়ে যায় দারুনভাবে রেগে গিয়ে নিজ দেশের মধ্যে যারা হাত গুটিয়ে বসে থাকা বাঙালিদের উদ্দেশ্য করে টুনু বলে ঃ

> "শালারা শুয়োরের বাচ্চা শালারা কুত্তার বাচ্চা, এদের জন্মের ঠিক নেই, শালারা বসে বসে মার খাচ্ছে, এদের কাছে ইজ্জতেরও কোনো দাম নেই, এদের মুখে আমি মুতে দিই–' (এনাম, ২০২০ ঃ ৩৫৪)।

উপন্যাসের সর্বশেষ অধ্যায়ের নাম 'ম্যাজিক মুকুল'। টুনু রেহানাকে নিয়ে গেলে ইয়াকুব অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। সে রেহানাকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনতে থাকে। মুকুল বলে ঃ 'তাহলে এহনে তুই ফিরি'– ... 'হ ডিউটিও পাইছিলি একখান, বাঁইচা গ্যাছস' (এনাম, ২০২০ ঃ ৩৫৬)। যুদ্ধের ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে। মুকুল যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে সদাব্যস্ত। সে ইয়াকুবকে বলে ঃ 'আইজকা তরে মেজিক দ্যাহামু, মেজিক বোঝছ'? (এনাম, ২০২০ ঃ ৩৫৬) কিছুক্ষণের মধ্যেই আদিনাথের ভিটেই ৭ জন টগবগে তরুণ অস্ত্রসহ হাজির। এদের সবাই দেশের জন্য ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারাই তালতলার ক্যাম্পও ঝাঁঝরা করেছিল। মুকুল তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় ইয়াকুবের ঠিক এভাবে ঃ 'কাউলকা তালতলার ক্যাম্প এই পোলাপানগুলি ঝাঁঝরা করছিল, এই হইল গিয়া তর আবুল কমান্ডার, আমাগো আউটশাহির পোলা–'(এনাম, ২০২০ ঃ ৩৫৬)। দেখতে দেখতে মিঠুসাবের আদিনাথের ভিটে যুদ্ধ পরিচালনার অন্যতম ঘাটিতে পরিণত হলো ।যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্য দিয়েই মাহমুদুল হক তাঁর *খেলাঘর* উপন্যাস শেষ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের মতো শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সমভাবে প্রবহমান। সৃষ্টিশীল লেখক মাত্রই এই প্রভাব থেকে নিজেকে এবং তার সৃষ্টিকর্মকে দূরে রাখতে পারেননি। দেশমাতৃকার জন্য নিবেদিত-প্রাণ বাঙালি নারী-পুরুষ পৈশাচিকতার গ্লানিকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে সকল সংগ্রামে। তাদের এই আত্মত্যাগ, সম্ভ্রমহীনতা, লাঞ্ছনা জাতি আজও শ্রদ্ধাভরে মনে রেখেছে।সৃষ্টিশীলতায় অনন্য মাহমুদুল হকও তাঁর *খেলাঘর* উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় চরিত্র মনোবিকলনগ্রস্থ রেহানার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত বীরাঙ্গনার মর্যাদায় আসীন করেছেন। রেহানার চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করলেন, দেশের জন্য কোনো ত্যাগই কখনো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় না– সময়ের পরিক্রমায় জাতি একদিন তা চূড়ান্ত মর্যাদায় আসীন করে। *খেলাঘর* উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত যুদ্ধাক্রান্ত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকালীন ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েনের সঙ্গে যুদ্ধাক্রান্ত বাংলাদেশ, যুদ্ধদৃশ্যাবলি, যুদ্ধ সম্পর্কে ব্যক্তিমনস্তত্ত্ব সমান্তরাল স্রোতে প্রবহমান এবং অনেকাংশে তা পরস্পরের প্রতীকার্থেও উপস্থাপিত।

তথ্যসূত্র

আলপনা, অয়নিকা। (২০১৭)। *মাহমুদুল হকের উপন্যাস-শিল্পমানস ও মুক্তিযুদ্ধচেতনা*। বেহুলা বাংলা, ঢাকা।

রহমান, আমিনুর সুলতান । (১৪২৪)। *কালি ও কলম*। মাহমুদুল হকের উপন্যাস ঃ অন্য এক বীরাঙ্গণা, ঢাকা।

এনাম, আবু হেনা মোস্তফা। (২০২২)। *মাহমুদুল হক রচনাবলি*। প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(হাসনাত আবুল, হক , মফিদুল ও এনাম , আবু হেনা মোস্তফা) সম্পা। (২০১০)। *আলোছায়ার যুগলবন্দি মাহমুদুল হক স্মরণে*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

বড়ুয়া, বিপ্রদাস (২০১০)। *খেলাঘর আন্না প্রকৃতি*। মাহমুদুল হক; আবুল হাসনাত, মফিদুল হক ও আবু হেনা মোস্তফা এনাম সম্পা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সরকার, মান্নান আবদুল। (২০০৭)। *বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার কুশীলব*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

নাহার, কামরুন। (১৪২৭)। *মাহমুদুল হকের উপন্যাস ঃ জীবন বাস্তবতার মিথস্ক্রিয়া*। রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ২, শরৎ।

www.gotipoth.com

The author declares the originality of the paper.
The journal authority is not accountable for any estimations of the author presented in the article.